ভূমিকা

।। ভূমিকা ।।

বাংলা তথা বিশ্বগদ্যসাহিত্যের জনপ্রিয় শিল্প সংরূপ ছোটগল্প। ছোটগল্প সীমায়িত দর্পণে বিশ্বদর্শন। যদিও গল্পকথার শুরু হয়েছিল অনেক আগে। সভ্যতার সৃষ্টি ও বিবর্তনের ধারায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের গল্প বলা ও শোনার অদম্য আগ্রহ। গল্পের আবির্ভাব নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের বিশিষ্ট সমালোচক তথা ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য অবশ্যই প্রণিধান যোগ্য — "প্রথমতঃ তরুণদের শিক্ষা দান — জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলবার মূল্যবান উপদেশ, দ্বিতীয়তঃ আনন্দের পরিবেষণ। জ্ঞানাঞ্জন-প্রলেপন এবং চিত্ত-বিনোদন, এই দ্বৈত প্রেরণা থেকেই গল্পের আবর্ভাব।"[১] গল্পের উৎস সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — "কাব্য সভ্য মানুষের প্রাচীনতম সাহিত্য কীর্তি; কিন্তু গল্প তার পূর্ব থেকেই আছে। দু'লক্ষ বছর আগে হাইডেলবার্গের গুহায় বসে মানব শিশু তার দিদিমার কাছে গল্প শুনত। গল্পের কল্পলোকে সেদিন মানুষের মন উধাও হয়ে যেত।"[২] প্রাচীন যুগের গল্পগুলি মূলত তৈরী হয়েছিল দৈবিক-আধিদৈবিক বা প্রাকৃতিক প্রভৃতি যে কোনরকম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য, সেই সব গল্পগুলি ছিল শ্রুতি নির্ভর, সমাজের প্রবীন প্রজন্মের মানুষেরা তাদের নবীন প্রজন্মকে নানারকম গল্পের উদাহরণ দিয়ে (খরগোসের গল্প, রাখালের গল্প, লাল পরী-নীল পরীর গল্প) তাদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করতেন। এই ধরনের শ্রুতি-নির্ভর গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে — Fable বা উপকথা, পঞ্চতন্ত্রের গল্প, Fairy Tale বা রূপকথার গল্প প্রভৃতি। এই ধরনের মৌখিক গল্পগুলির উদ্দেশ্য ছিল — গল্পের ছলে সৎ উপদেশ বা নীতি শিক্ষা। তাই এই গল্পগুলির অধিকাংশই করুণ বা ট্র্যাজিক রসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েও শেষ হত বীর রসের মধ্যে মিলনান্তক ভাবে। তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুগের বদল হয়েছে। মানুষ অনেক কিছু নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। ধীরে ধীরে মানুষের মুখে মুখে তৈরী হওয়া এবং সমাজে প্রচলিত গল্পগুলি বইয়ের পাতায় লিপিকরের সাহায্যে মুদ্রিত হল উপকথা এবং রূপকথা নামে।

সাহিত্যের পরিভাষায় থাকে আমরা Short Story বা ছোটগল্প বলে থাকি — তা একটা স্বতন্ত্র, স্বয়ং সম্পূর্ণ পৃথক সাহিত্য-সংরূপ। এর সঙ্গে প্রাচীন যুগের উপকথা বা রূপকথার গল্পের যেমন কোন সাদৃশ্য নেই, তেমনি পরবর্তীকালে দেশে বিদেশের সাহিত্যে যাকে নভেলেট বা বড়গল্প বলা হয়ে থাকে তার সঙ্গেও কোন মিল নেই। ছোটগল্প উনবিংশ শতাব্দীর একটি আশ্চর্য ফসল — 'A peculiar product of nineteenth century'. পৃথিবী বিখ্যাত মার্কিন লেখক এড্‌গার অ্যালান পো ন্যাথানিয়েল হথর্ন-এর 'টোয়াইস টোলড্ টেলস্' (১৮৩৭ খ্রী.)। নামক বিখ্যাত গল্প

সংকলনের সমালোচনায় ছোটগল্প সম্পর্কে বলেছেন — "We allude to the short prose narrative, requiring from a half-hour to one or two hours in its perusal.[৩] আবার H. G. Wells ছোটগল্পের সম্পর্কে যা বলেছেন তাকে বোধহয় অনায়াসে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ড বলা যেতে পারে — "A short story, is or should be, a simple thing; it aims at producing one single vivid effect; it has to seize the attention at the onset, and never releasing, gather it together more and more until the climax is reached. The limits of the human capacity to attend closely therefore set a limit to it; it must explode and finish before interruption occurs or fatigue sets in."[৪] 'দ্য ফিলসফি অ্যাণ্ড শর্ট স্টোরি' প্রবন্ধে আবার ব্র্যানডার ম্যাথুজ ছোটগল্পের সংজ্ঞায় বলেছেন — " A true short story is something other and something more than a mere story which is short. A true short story differs from the novel chiefly by in its essential unity of impression."[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক ছোটগল্পকে মানুষের যন্ত্রণার ফসল বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে — "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"[৬]

সাহিত্যের এই সর্বাধিক দ্বন্দ্ব-মতান্তর এবং সমালোচিত শাখা ছোটগল্প বা short story অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মতই বাংলা সাহিত্যেও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প আমরা পাই উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। তবে ছোটগল্পের সংজ্ঞা কিংবা বৈশিষ্ট্যের মতোই বাংলা ছোটগল্পের জন্ম বা উদ্ভব নিয়েও নানা বিতর্ক রয়েছে। ১২৭৯-৮০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদক তথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দিরা' কিংবা 'যুগলাঙ্গরীয়'-কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক প্রথম ছোটগল্প বলে চিহ্নিত করেছেন — তবে একথাও ঠিক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই দুটি রচনাকে কখনোই ছোটগল্প বলে আখ্যা দেন নি — বরং তিনি এগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস বলেই আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আবার কোন কোন সমালোচক 'বঙ্গদর্শন'-এর অন্যতম লেখক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' (১২৮০ বঙ্গাব্দ) গল্পটিকে প্রথম বাংলা ছোটগল্প বলে আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' এবং 'দামিনী' এই দুটি রচনাও ছোটগল্প হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল। তার ওপর স্বর্ণকুমারী দেবী বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই সময় বেশ কিছু ছোট আকারের গল্প রচনা করেছিলেন। তবে একথাও ঠিক যে, উল্লিখিত গল্পকারদের গল্পগুলি ছোটগল্প বলে বিবেচিত বা সাময়িক স্বীকৃতি পেলেও — সেগুলি আঙ্গিকগত এবং প্রকরণগত দিক থেকে অর্থাৎ ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সেগুলিকে কোন ভাবেই যথার্থ ছোটগল্পে মর্যাদায়

উন্নীত করা যায় না। কেবলমাত্র ছোটগল্পের প্রয়াস হিসেবেই শিল্পী মহলে বিবেচিত হয়েছে। আর তাই বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বা শিল্প-নির্মাতা তথা জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ)।

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন শিল্পী — যাঁর হাতে যে কোন শাখার সাহিত্যই পুষ্পে পুষ্পে চতুর্গুণ বিকশিত হয়েছে। আর ছোটগল্পের কথাতো বলাই বাহুল্য — তিনি শুধু ছোটগল্পের জনকই নন, তাঁর হাত ধরেই বাংলা ছোটগল্প ভ্রূণের খোলস থেকে বেরিয়ে শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত করে যৌবনের ডালি নিয়ে শাখায়-শাখায়, বৃন্তে-বৃন্তে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। ছিন্ন পত্রাবলীর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর ছোটগল্প রচনার প্রস্তুতি পর্বের কথা — "এক এক সময় মনে হয়, আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে — লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়। সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধহয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে।"[৭] রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কথা সাহিত্যের নতুন সংরূপ 'ছোটগল্প' যে যথার্থ রূপাঙ্গিকে, যথার্থ শিল্প ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল তার উদ্দীপন বিভাব রূপে কাজ করেছে সেই সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে কবির জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়ে কলকাতা তথা ঠাকুরবাড়ির বনেদী মহল ছেড়ে শিলাইদহে এবং সাজাদপুরের গ্রাম্য-প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যময় পরিবেশে মাটির কাছাকাছি বাস করা। আর প্রকৃতির একাত্ম রূপময় জগতের নিবিড় উপলব্ধির সঙ্গে অতি সাধারণ, দীন-দুঃখী কিংবা হতদরিদ্র মানুষের জীবনকে একেবারে কাছ থেকে সামনা-সামনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাই তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিল ছোটগল্প রচনার দিকে। কারণ ছোটগল্প এমন একটি সাহিত্য, যার মধ্য দিয়ে জীবনের কোন একটি বিশেষ খণ্ডাংশকে উজ্জ্বল আলোকে প্রতিফলিত করা যায় — যেখানে বৃহৎ মানব জাতি নয়, কেবলমাত্র একজন সামান্য কিংবা অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিমানুষও সাহিত্যের দর্পণে প্রতিভাত হয়ে ওঠে তার কোন একটি নির্দিষ্ট জীবন সমস্যা কিংবা জীবনের কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

তাই একদিকে বিরাট-বিপুলা মোহময়ী প্রকৃতির প্রতি নিরবচ্ছিন্ন প্রেম আর কঠোর বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে মূলধন করেই বিশ্বকবির তরবারি নিষ্কোষিত হল ছোটগল্পের স্রোতস্বিনী ভুবনে 'ভিখারিণী' (১২৮৪ বঙ্গাব্দ, ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল) নামক গল্পটির মধ্য দিয়ে। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই গল্পটিকে ছোটগল্প বলে স্বীকৃতি দেন নি। এর কয়েক বছর পর রচিত ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঘাটের কথা' গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম স্বার্থক ছোটগল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি রচনার পেছনে রয়েছে সাময়িক পত্রের চাহিদা। সেই সময়-পর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি।

যেমন 'ভারতী'-র পর 'হিতবাদী' (১৮৯১ খ্রীঃ) পত্রিকার সাহিত্য শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্র ছোটগল্পের সূচনাপর্বের। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'গ্রামীণ', এখানে সহজ-সরল প্রকৃতির নিবিড় রূপের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে পল্লীজীবনের নানা চিত্র। এরপর 'ভারতী-সাধনা' পর্বে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন নাগরিক। এই পর্বকেই বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ। এখানে নতুন ভাবে-ভঙ্গিতে তাঁর ছোটগল্প নতুন থেকে নতুনতর হয়ে উঠল। এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'গল্প ভাঙ্গার গল্প'। অর্থাৎ পুরাতন কোনো মিথকে ভেঙে, কিংবা কোন বিশেষ সাহিত্য প্রবণতাকে ভেঙে তিনি লিখলেন নতুন গল্প। এখানে 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'শাস্তি', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'সুভা', 'কঙ্কাল', 'মুক্তির উপায়', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হল মানব জীবনের অনেক অজানা-অচেনা বিস্ময়, অনেক রহস্য, অনেক গভীরতা-প্রসারতা।

এরপর এল ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের জীবনের সেই 'সবুজপত্র' পর্ব — যেখানে তিনি বাংলা ছোটগল্পকে বিষয়গৌরবে, কাহিনীর নতুনত্বে, শিল্পরূপের উৎকর্ষময় প্রকাশে, নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে পৌঁছে দিলেন বিশ্বসাহিত্যের প্রসারিত দরবারে। 'সবুজপত্র' পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল — 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীরপত্র', 'নষ্টনীড়', 'হৈমন্তী', 'পয়লা নম্বর' প্রভৃতি। 'সবুজপত্র' পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পে একটা পরিবর্তন এসেছিল। প্রথমত, এই পর্ব থেকে তিনি চলিত গদ্যে ছোটগল্প রচনা শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, বিষয়গত দিক থেকেও পরিবর্তন এসেছিল এই পর্বে। এতদিন তাঁর ছোটগল্পে ছিল জীবনের রূপ রচনা, এবার তিনি জীবনের ভাষ্য রচনা করতে প্রয়াসী হলেন। তবে 'সবুজপত্র' পর্বে বিষয়বৈচিত্র্য আর থাকল না। এখানে রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের চিরন্তন পারস্পরিক সম্পর্কেই আবার নতুন করে কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখে নিতে চেয়েছিলেন যে — একটি নারীর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা কোথায়? সে কি নারীত্বে? নাকি তার পত্নীত্বে? কিংবা মাতৃত্বে? এখানে উঠে এল সম্পর্কের নতুন মূল্যায়ন। যেখানে দাম্পত্য কেবলমাত্র কোনো বন্ধন হয়ে থাকবে না নারীর কাছে, যেখানে নারী উন্মুক্ত পরিবেশে নিজস্ব জীবন ভাবনাকে প্রকাশ করতে পারবে। তবে একথাও ঠিক রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্ককে যতই নতুন ডাইমেনশনে দেখার চেষ্টা করুন না কেন — শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁর গল্পের নায়িকারা নিজেদের জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন পথে পরিচালিত করতে পারে নি। পরিবার এবং সমাজনীতির অদৃশ্য বন্ধন যেন তাদের শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল। তাই 'স্ত্রীরপত্র'-এর মৃণাল স্বেচ্ছায় একা স্বাধীন ভাবে বাঁচার কথা ভাবতে পারে না — তাকে পিসিমার সঙ্গে কাশী চলে যেতে হয়।

'সবুজপত্র'-এর পর রবীন্দ্র ছোটগল্প শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হল 'তিনসঙ্গী' পর্বের

গল্পের মধ্য দিয়ে। এখানেই তাঁর গল্প ভাবনার সম্যক সিদ্ধি; পাহাড়ের শীর্ষদেশ ছুঁয়ে ফেলা কবি সম্পূর্ণ নতুন স্বাদে, নতুন অভিজ্ঞতায়, প্রগাঢ় প্রাজ্ঞতায় লিখলেন — 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরী' এবং 'শেষ কথা'-র মতো ছোটগল্প। আর এভাবেই সম্পূর্ণ নতুন একটা সাহিত্য সংরূপের জন্ম থেকে শৈশব-কৈশোরকে অতিক্রম করে — যৌবনের প্রদীপ্ত আলোকে আলোকিত উদ্দীপিত হয়ে উঠল বাংলা ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিশাল গগনচুম্বী সৌধ স্থাপিত হল কালের যাত্রায়। আর বাংলা ছোটগল্প তার যাত্রাকে অগ্রসর করতে এগিয়ে গেল — আগামীর পথে।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা ছোটগল্পের প্রসারিত অঙ্গনেই নিজের কৃতিত্ব আর অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছোটগল্প রচনায় এগিয়ে এলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথের অনুগামী হলেন না, বরং তিনি নিজের ওজস্বিতা বুঝে, নিজের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, সামাজিক জীবনের নানা ওঠা-পড়া, সমাজের নানাবিধ অনুশাসন-সংস্কার, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একাধিপত্যের কুফল, জাত-পাতের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করেই গল্প রচনা করলেন। 'মন্দির' (১৩০২ বঙ্গাব্দ) নামক ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে যাত্রারম্ভের প্রথম লগ্নেই বিভূষিত হয়ে ছিলেন 'কুন্তলীন' পুরস্কারে। তারপর 'রামের সুমতি', 'বড়দিদি', 'মেজদিদি', 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ', 'একাদশী বৈরাগী', 'অনুপমার প্রেম' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করে গিয়েছেন শরৎচন্দ্র। সমাজবাস্তবতার দিক থেকে তাঁর গল্পগুলির মূল্য অপরিসীম। যদিও কথাসাহিত্য-সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প সম্পর্কে লিখেছেন — "শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি অনুধাবন করলে মূলত দু'ধরনের বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় — প্রেমের নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণ, আর স্নেহ-বাৎসল্যের তির্যকগতি।"[৮] একদিকে সমাজ বাস্তবতার নিষ্ঠুর-নির্মম উপস্থাপনা, আর অন্যদিকে প্রেম-বাৎসল্যের মোহময় উপস্থাপনায় শরৎচন্দ্র হয়ে উঠলেন বাংলা ছোটগল্পের একজন প্রতিভাবান জনপ্রিয়শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের ভগীরথ। তাই তাঁর প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ভাবেই পড়েছে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের ছোটগল্পকারদের মধ্যেও। রবীন্দ্রনাথের প্রসাদপুষ্ট, তাঁর আশীর্বাদ ধন্য হয়ে যিনি শরৎচন্দ্রের পর বাংলা ছোটগল্পের অঙ্গনে পা রাখলেন —তিনি বিশিষ্ট ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় প্রভাতকুমারের নাম কৌতুকরসের ছোটগল্পকার হিসেবেই সমধিক পরিচিত। জীবনের নানা অসংগতি, সমাজ ব্যবস্থার নানা গলদ-ত্রুটি এ সকল কিছুকে তিনি ছোটগল্পের আধারে রঙ্গ-রসের পরিবেশনে তুলে ধরেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল — 'রসময়ীর রসিকতা', 'বলবান জামাতা', 'কাশীবাসিনী', 'দেবী', 'মাতৃহীন' প্রভৃতি। তিনি যে অন্য ভাবনার গল্প একেবারেই লেখেননি তা নয়। তবে রঙ্গ রসের রচনাতেই প্রভাত কুমারের সর্বোচ্চ কীর্তি ও সাফল্য। প্রভাত কুমারের সমসাময়িক কালে আরো যে দু'জন গল্পকার বাংলা ছোটগল্পের

জগৎ তাদের রঙ্গ-ব্যঙ্গ রসের গল্পদ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন — তাঁরা হলেন, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পরশুরাম তথা রাজশেখর বসু। এঁরা স্ব-স্ব প্রতিভা এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মল কিংবা ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের মাধ্যমে ছোটগল্প রচনা করে পাঠক কুলকে যেমন বৈচিত্র্যের আস্বাদ দিয়েছিলেন, তেমনি সমাজের কাছে অনেক নূতন বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই সময়কালের আরেকজন লেখক যিনি প্রবন্ধ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পের জগতেও স্বপ্রতিভ ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাঁর নাম প্রমথ চৌধুরী। তাঁর হাতে বাংলা ছোটগল্প এক বিশিষ্ট রূপ পেয়ে স্বতন্ত্র আস্বাদে ভরপুর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের জগতে বিরাজ করছেন, কিংবা শরৎচন্দ্র যখন তাঁর প্রতিভায় জনরুচির শিল্প রচনা করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছেন সেই সময় প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'চার-ইয়ারী কথা'-র মতো গল্প নিয়ে আবির্ভূত হয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। কোন তত্ত্বের প্রয়োগে নয়, কোন বিশিষ্ট মতাদর্শকে নয়, কিংবা কোন নতুন আঙ্গিক বা কর্মের প্রতিষ্ঠা নয় — প্রমথ চৌধুরীর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছিল নির্ভেজাল গল্পরস। নিজের বিদগ্ধ মননশীলতায় তিনি যে কয়েকটি ছোটগল্প রচনা করেছেন তা যেমন স্বাদে অনন্য, তেমনি শিল্পগুণেও ব্যতিক্রমী।

এরপরই এল বাংলা ছোটগল্পের সেই পালা বদলের বেলা অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক। রবীন্দ্রনাথকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে, তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা বজায় রেখে, শরৎচন্দ্র কিংবা প্রভাতকুমার, পরশুরাম কিংবা ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার প্রতি যথাযোগ্য আনুগত্য প্রকাশ করেও সেই সময় একদল তরুণ লেখক সম্পূর্ণ রূঢ়-কঠিন বাস্তবতাকে অধিগ্রহণ করে সমকালীন নানা পরিস্থিতিকে প্রেক্ষাপট করে নিজেদের লেখনীকে প্রসারিত করলেন নতুন ভাবে, নতুন রীতিতে, নতুন বিষয়ে গল্প রচনার জন্য। এঁরা রবীন্দ্রনাথের তৈরী রাজপথের পথিক না হয়ে নিজেদের প্রতিভায় গড়ে তুললেন নতুন মেঠো পথ — আর সে পথেই নিজেদের স্বতন্ত্রতা নিয়ে গল্প রচনা করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং বাংলা ছোটগল্পকেও ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছেন। সমসাময়িক দেশীয় রাজনীতি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জনিত যুবসমাজের বেকারত্বের হতাশা-যন্ত্রণা, তীব্র আর্থিক সংকট, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকটপূর্ণ অনিশ্চয় জীবন, সেই সময়কার সেন্সেটিভ-নব-তরুণ লেখককুলকে উদ্বোধিত করে তোলে নতুন ভাবে, নতুন রীতিতে, নতুন বিষয়ে গল্প লিখতে। আর 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে এই নতুন-বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ লেখকদল রবীন্দ্র ছোটগল্পের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন। এই সূত্রেই এলো বিদেশী ভাবধারার সঙ্গে যোগ সাধন। তাঁদের ভাবনায় গৃহীত হল মার্কস, ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস, এলো বিশ্বজনীন মধ্যবিত্ত মানসিকতা এবং প্রেম-যৌনতা-মনস্তত্ত্বের বাস্তব ব্যবহার। বদলে গেল ছোটগল্পের বিষয় ও রূপ। তরুণ বাঙালী লেখকদের লেখায় গৃহীত হল দস্তয়ভ্স্কি, গোর্কি, টলস্টয়, লরেন্স, মোঁপাসা, ফ্লবেয়ার, রোমা রোলাঁ, এমিল জোলা প্রমুখ লেখকরা।

'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে একদল তরুণ লেখক উঠে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রমুখ। তবে অচিন্ত্যকুমার বা প্রেমেন্দ্র মিত্র কিংবা বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পের জগতে আবির্ভাবের পথকে আরও প্রশস্ত করেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। আসানসোলের কোলিয়ারির প্রেক্ষাপটে লেখা 'কয়লাকুঠি' নামক গল্প নিয়ে আবির্ভূত হয়ে তিনি সেদিন বাংলা ছোটগল্প পাঠককে রীতিমত চমকে দিয়েছিলেন-বিস্মিত করেছিলেন। সাঁওতাল-কুলি-কামিনদের জীবন নিয়ে তিনি স্ব-হৃদয়তার সঙ্গে এমন কাহিনীকে পাঠকের দরবারে পরিবেশন করেছিলেন — তা সর্বস্তরের পাঠক-সমালোচককে আকৃষ্ট-অভিভূত-আপ্লুত করেছিল। তবে 'কয়লা কুঠি' গল্পটি ছাড়াও শৈলজানন্দ তাঁর 'নারীমেধ', 'বধূবরণ', 'জোহানের বিহা', 'ধ্বংস পথের যাত্রী এঁরা' প্রভৃতি গল্পগুলিতেও নিজস্ব নির্মোহ-নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে, গভীর মননশীলতায়, পরিশীলিত কথনভঙ্গিতে যথেষ্ট সাবলীলতার ছাপ রেখে গেছেন।

'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যাঁরা সাহিত্য তথা ছোটগল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিন পুরোধা ব্যক্তি হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু। বিংশ শতাব্দীর প্রথম এবং দ্বিতীয় দশকে যে সকল ছোটগল্পকার গল্প রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একজন বিশিষ্ট লেখক। সরকারী চাকরি জীবনের জন্য বাংলার বিভিন্ন গ্রামে, শহরে-শহরতলীতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল অনেক নর-নারীর। তিনি জেনেছিলেন এদের জীবন সংগ্রাম, জীবনের নানাবিধ সমস্যা-সংকুলতা, বেঁচে থাকার লড়াই-এর কথা। আর এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ছোটগল্পের জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গুমোট' গল্পটি তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প। যদিও ইতিপূর্বেই 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'বাদল বাতাস', 'আলতার দাগ', 'কারসাজি' গল্প তিনটি প্রকাশিত হয়েছে, তবে 'কল্লোল'-কে কেন্দ্র করেই অচিন্ত্যকুমারের গল্প ধারা স্রোতস্বিনী হল। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে — 'ভুখা', 'সাহেবের মা', 'ন যযৌ ন তস্থৌ', 'বাঁশবাজি', 'মাটি', 'সারেঙ্' প্রভৃতি। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম দিকের গল্পগুলিতে কবিত্বময় ভাবুকতার একটা পরিচয় পাওয়া যায় — 'আলতার দাগ' বা 'ইতি' গল্প দুটি তার উদাহরণ। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমার সচেতন ভাবে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলেছেন। আর তাই ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকে অবলম্বন করে তিনি লিখলেন নতুন গল্প। প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতাকে বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে গল্পকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিলেন। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যা অবলম্বন করে লিখলেন 'বস্ত্র', 'দাঙ্গা', 'নূরবানু' প্রভৃতি গল্প। তবে অচিন্ত্যকুমারের গল্পে কল্লোলের গল্প লেখকদের মূল সুর অর্থাৎ প্রেম না পাবার যন্ত্রণা, প্রেমহীন দাম্পত্য, পুরোনো সংস্কারের প্রতি বিদ্রূপ এই সব লক্ষণ খুব একটা

প্রকাশ পায় নি। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর জনিত কারণে সাধারণ মানুষের দুর্দশা-অভাব প্রভৃতি চিত্রই প্রধানত রূপ পেয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে যে তরুণ লেখকেরা রবীন্দ্র বিরোধীতায় সোচ্চার হয়ে আসরে নেমেছিলেন — প্রেমেন্দ্র মিত্র তাদেরই একজন। প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলত নগর জীবনের রূপকার। নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, যারা প্রখর নীতিবাদী আবার নীতির দ্বারা প্রবঞ্চিত। এরকম মানুষের কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। নিম্ন মধ্যবিত্ত নারী-পুরুষের প্রেম সম্পর্ক, প্রেমহীন সম্পর্ক, অবসিত প্রেম, প্রেমহীন দাম্পত্যের শৃঙ্খল এসবই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের অভ্যস্ত পরিমণ্ডল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় দিক উপস্থাপন পদ্ধতি। পরিমিত কথন ভঙ্গিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনা করেছেন তাঁর ছোটগল্পগুলি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য সৃষ্টির একটা বড় গুণ তিনি বাস্তবের রূপকার। কেবলমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করে মধুর মিলনাত্মক কিংবা কারুণ্যময় গল্প তিনি লেখেন নি — তিনি সর্বদাই চোখে দেখা বাস্তবতার বর্ণহীন-উন্মুক্ত চেহারাটা সরাসরি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে। আর তাই কবিতার ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র রোমান্টিক মন নিয়ে — "কোনো পথ যেখানেতে নেই/ সেখানেতে খেলে এক খেই/ আরেক আশার"[৯] কথা লিখলেও গল্পে-উপন্যাসে তিনি 'নীড় ভেঙ্গে যাওয়ার' কথাই বলেন — সেখানে দিতে পারেন না কোনও মিথ্যে আশ্বাস।

বাংলা ছোটগল্প যখন বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে — যখন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট পথকে পাশ কাটিয়ে চওড়া গলি পথে এগোচ্ছেন ছোটগল্পকাররা তাদের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব নিয়ে — ঠিক সেই সময়েই কল্লোলের অন্যতম শক্তিধর লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব। সমসাময়িক গল্পের প্রবণতাকেও সর্বাঙ্গে গ্রহণ করেন নি প্রেমেন্দ্র মিত্র। মূলত প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টিতে মানুষের প্রতি মমত্বময় সহানুভূতিই উৎসারিত হয়েছে। মানুষের সামাজিক অবস্থান জনিত বিভিন্ন সংকটকে তুলে ধরেছেন গল্পে দেহে। প্রথম গল্প 'শুধু কেরাণী' থেকে পরবর্তীকালে প্রকাশিত একাধিক গল্প 'হয়তো', 'স্টোভ', 'কুয়াশায়', 'মোট বারো', 'শৃঙ্খল', 'পাশাপাশি', 'মহানগরী', 'তেলেনাপোতা আবিস্কার' প্রভৃতি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পগুলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের প্রকৃতি।

দীর্ণ সময়ের নানা প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবনের পথে হেঁটেও যিনি জীবনের সমস্ত জটিলতা-কুটিলতা-লড়াইকে একপাশে সরিয়ে রেখে জীবনের পান পাত্র থেকে কেবল ভালোবাসার মদিরাটুকুকে গ্রহণ করেছিলেন — তিনি বাংলা ছোটগল্পের ব্যতিক্রমী শিল্পী বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বসু একজন নাগরিক লেখক। তাঁর ছোটগল্পে সমাজ ভাবনা বা সমাজের ছবি সেভাবে উঠে আসেনি। তিনি প্রেম-রোমান্টিকতা আর ভালোবাসা দিয়ে জীবনের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে নিজের

দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন। যদিও তাঁর ছোটগল্পের ভুবন বৃহৎ এবং বৈচিত্র্যধর্মী তবুও তার প্রেম বা রোমান্টিক চেতনাই প্রছন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়েছে গল্পের মধ্যে। একদিকে নানাবিধ বিষয়বস্তু আর পৃথক পৃথক রচনা রীতির সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পের সৌধ। তাঁর 'অভিনয়, অভিনয় নয়', 'রঙিন কাঁচ', 'এরা আর ওরা', 'প্রেমের বিচিত্র গতি', 'ভাসো, আমার ভেলা' প্রভৃতি গল্প সংকলনের গল্পগুলির মধ্য দিয়ে স্বাদে-বৈচিত্র্যে অতুলনীয় হয়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে পথিকৃৎ রূপে নিজের আসন চিহ্নিত করে গেছেন।

ঠিক কল্লোল যুগের লেখক বলে চিহ্নিত না হলেও, কল্লোলের সমসময়ে এবং ঈষৎ পরবর্তী কালে আবির্ভূত হয়ে বাংলা ছোটগল্পের সমৃদ্ধময় জগৎকে আরও স্বাদে-গন্ধে-রসে টইটম্বুর করে তুলেছেন যে দু'জন গল্পকার তারা হলেন — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎ পরবর্তী কথা সাহিত্যে প্রদীপ্ত সূর্যের মতো নিজেদের প্রতিভার বিকিরণকে বিচ্ছুরিত করেছিলেন এই দুই মহান কথা শিল্পী। যদিও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাদের সর্বাধিক কৃতিত্ব অবিসংবাদিত; তবুও ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে এঁরা কেউই পিছিয়ে ছিলেন না। নিজেদের অকল্পনীয় মেধা-কৃতিত্ব আর প্রগাঢ় পারদর্শিতা নিয়ে এঁরা দুজনেই কৃতী শিল্পীর শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। প্রত্যেকের নিজস্ব জীবনদর্শন, পৃথক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন ভাবনা থেকে এঁরা তৈরী করেছিলেন ছোটগল্পের দুটি সমান্তরাল ধারা। একদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা পুরোনো সংস্কার-মূল্যবোধ নিয়ে লিখলেন 'জলসাঘর', বা 'তারিণী মাঝি', 'বেদেনী' কিংবা 'অগ্রদানী'-র মত গল্প। আর অন্যদিকে বিপুল-অপরিসীম প্রকৃতি প্রীতি এবং মানব প্রীতিকে সম্বল করে বিভূতিভূষণ লিখলেন — 'মৌরীফুল', 'পুঁইমাচা', 'উপেক্ষিতা', 'সুফীর কাণ্ড', 'হিঙের কচুরী'-র মতো সব অনন্য আস্বাদী গল্প।

'কল্লোল', 'কালিকলম' এবং 'প্রগতি'-পত্রিকা ছাড়াও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে আরও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করেও এক ঝাঁক তরুণ তুর্কি উঠে এসেছিলেন। 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রিকা অবলম্বন করে নিজেদের রচিত ছোটগল্পকে পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে সকল ছোটগল্পকার তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, অন্নদাশংকর রায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ। এদের মধ্যে সকলেই হয়ত সমান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি; তবে এই লেখক গোষ্ঠী থেকে এমন দু-একজন ছোটগল্পকার উঠে এসেছিলেন যাঁরা পিছিয়ে শুরু করলেও নিজের প্রতিভার গুণে প্রথম সারিতে নিজেদের স্থানকে সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছিলেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অন্নদাশংকর রায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নিজের সহজাত

প্রতিভা আর জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে নির্মল হাস্যরসের আধারে জীবনের নানা অসঙ্গতি, বিচিত্র বা উদ্ভট সব বিষয়ের রূপদান করে বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে নিজের নামটি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর লেখা, 'রানুর প্রথম ভাগ', 'বরযাত্রী' প্রভৃতি গল্পগুলি যেমন সুখপাঠ্য তেমনি শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকেও সাফল্য মণ্ডিত।

এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার বনফুল। তিনি বাংলা ছোটগল্প নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন রূপাঙ্গিক সমন্বিত ছোটগল্পের সৃষ্টি করেছিলেন — তা হল 'অনুগল্প'। বনফুল মূলত বাংলা অনুগল্পের প্রকৃত স্রষ্টা। গভীর জীবন দর্শন, মানবপ্রীতি, প্রখর দূরদৃষ্টি আর পরিশীলিত দক্ষতা-মননশীলতা নিয়ে মাত্র কয়েকটি বাক্যের সীমারেখায় যেভাবে তাঁর গল্পগুলিকে বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ যথার্থতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তা কেবল সুখপাঠ্যই হয়নি — শিল্পগুণের বিচারেও সর্বোচ্চ শীর্ষে পৌঁছোতে পেরেছে। তাঁর 'তাজমহল', 'নিমগাছ', 'ক্যানভাসার', 'বুধ্নী' প্রভৃতি গল্পগুলিতে মানজীবনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী বিষয়গুলিকে অতি সংক্ষিপ্ত কলেবরে সংহত-পিনদ্ধ বাক্‌চাতুর্যে যেভাবে রূপদান করেছেন তা সর্বদেশে, সর্বকালে ঈর্ষণীয় হয়েই থাকবে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্নদাশংকর রায়ও নিজেদের জায়গা থেকে বেশ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে। শরদিন্দু পাঠকের মনে নিজের চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তার ডিটেকটিভ গল্পগুলির মধ্য দিয়ে। এখানে তিনি স্বতন্ত্র এবং সর্বশক্তিমান। তাঁর ব্যোমকেশ সিরিজের গল্পগুলি পাঠকের অনুভূতিতে শিহরণ জাগিয়ে কৌতূহলকে ক্রমবর্ধিত করে পাঠককে এক অন্য জগতের আস্বাদ এনে দেয়। তবে শুধু ডিটেকটিভ গল্পই তিনি রচনা করেন নি, ভূতের গল্প বা অলৌকিক রসের গল্প, হাস্যরসের গল্প, ঐতিহাসিক গল্প রচনার ক্ষেত্রে শরদিন্দু সমান ভাবেই সিদ্ধহস্ত। আর অন্নদাশংকর রায় যিনি প্রচলিত বিষয় ও রীতি থেকে একটু ভিন্ন পথে হেঁটে নিজের জীবন জিজ্ঞাসা আর জীবন সত্য দর্শনের সমন্বয়েই রচনা করেছেন ছোটগল্প। বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের পর কল্লোলীয়দের হাতে প্রথম নতুন বাঁক নিয়ে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র ধারাতে প্রবহমান হয়েছিল — তাতেই আরও একটু বৈচিত্র্য-নতুনত্বের ছোঁয়া দিয়ে ক্রমবিবর্তনের ধারায় এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল অন্নদাশংকর রায়ের ছোটগল্পগুলি।

'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে উঠে আসা একদল তরুণ প্রতিভাবান ছোটগল্পকারদের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্র-বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার যে নতুন পথ ধরেছিল। তাঁরা নিতান্ত বাস্তব রক্তমাংসের জীবনের ওঠা-পড়া, ভালো-মন্দ, প্রেম-অপ্রেম, যন্ত্রণা-দীর্ণতা, কর্মজীবী-শ্রমজীবী নর-নারীর রুধিরাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটা ভিন্ন সুর, ভিন্ন বার্তা দিয়েছিলেন বাংলা ছোটগল্প-পাঠককে। আর এই নতুন সুরে নতুন বার্তায় সেদিনকার পাঠকও সহজেই অনুরক্ত হয়েছিল

— সাহিত্যে-শিল্পে নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখে। আর সেই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল সাহিত্যে মর্ডানিটি বা আধুনিকতার। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পগুলি এই আধুনিকতার প্রবর্তক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই ধারায়ই নতুন সংযোজন জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের কেউই কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক নন — এঁরা প্রত্যেকেই 'Belated Collolion' তথা কল্লোলের কুলবর্ধক। প্রত্যেকেই নিজস্ব, নির্মম-নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা, নিয়ে রোমান্টিকতার প্রগলভ গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন, জীবনের মধ্য থেকে জীবনের কথা বলেছেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে। জগদীশ গুপ্ত যেমন জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য-তিক্ততার কথা বলেছেন, তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিবাদী (Naturalist) চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর প্রথম পর্বের ছোটগল্পগুলির মধ্যে আর তাঁর দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার ফসল। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়েছিল যখন, তখন বাংলা ছোটগল্প আরও একধাপ এগিয়ে অতি আধুনিক সাহিত্য বা যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের পর্বে পা রেখেছে।

এরপর বাংলা ছোটগল্প আবার নতুন বাঁক নিল বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের-পঞ্চাশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও দেশভাগের মতো হৃদয়বিদারক ঘটনাকে সাক্ষী রেখে। সাহিত্যের অন্যান্য সব ধারার মতোই ছোটগল্পেও যুক্ত হল Post War -এর তক্‌মা। এই ধারার পুরোধা পুরুষ হলেন সুবোধ ঘোষ। এই কালপর্বেই এক সঙ্গে উঠে এলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরীর মত একঝাঁক প্রতিভাবান ছোটগল্পকার। এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাময় ঐশ্বর্য নিয়ে ছোটগল্পে নব দিগন্তের উন্মোচন করলেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো মহান সাহিত্যিক তথা ছোটগল্পকারও উঠে এসেছিলেন এই সময়ের ধারাতেই। সমকালের অন্যান্য ছোটগল্পকারদের থেকে স্বতন্ত্র বিষয় ও আঙ্গিক এবং বাক্‌রীতির বৈচিত্র্যে তাঁর ছোটগল্পগুলি হয়ে উঠেছে অনন্য আস্বাদী। স্বতন্ত্র-চিহ্নিত সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী স্বল্প চর্চিত লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম পরিচয় ঔপন্যাসিক হিসেবে। ১৯৪৫-এর অক্টোবর মাসে 'সমবায় পাবলিশার্স' থেকে প্রকাশিত যুগান্তকারী উপন্যাস 'জাগরী'-র মধ্য দিয়েই সতীনাথের বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। অতঃপর বাংলা সাহিত্যের গুণমুগ্ধ পাঠকের কাছে তাঁর পরিচয় ঔপন্যাসিক সতীনাথ হিসেবে। কিন্তু শুধু উপন্যাসই নয়, সতীনাথ ভাদুড়ী যে একজন অত্যন্ত মনোজ্ঞ ছোটগল্পকারও ছিলেন — সেকথা সেদিনকার অনেক পাঠকের কাছেই ছিল অজ্ঞাত। কেবলমাত্র বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা সমালোচক এবং কয়েকজন সোৎসাহী সাহিত্য-গবেষক সতীনাথ ভাদুড়ীর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ছোটগল্পের কিছু কিছু আলোচনা করলেও, তা বিবিধ

বিষয়ের আলোচনার ভিড়ে সম্পূর্ণতা পায়নি। এছাড়া অবশ্য তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষেও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্প নিয়ে কিছু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে ঠিকই। সংখ্যায় অধিক না হলেও সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে, রূপাঙ্গিকে, উপস্থাপন পদ্ধতিতে, কাহিনী-কথনের বিশেষ ভঙ্গিতে কীভাবে অনন্য হয়ে উঠেছে, কীভাবে কথাসাহিত্য তথা ছোটগল্পের প্রচলিত বাক্‌প্রবাহের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্বতা-নতুনত্ব নিয়ে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মে বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আঙ্গিক নির্মাণে কীভাবে নতুনত্বের ছাপ রেখে চলেছিলেন; সর্বোপরি বাংলা ছোটগল্পের প্রবাহমান ধারায় সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলির অবস্থান ঠিক কোথায় এবং সমসাময়িক গল্পকারদের ছোটগল্পের সঙ্গেই বা তাঁর স্বাতন্ত্র্য কোথায় — এই বিষয়গুলিকে নির্ণয় করতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে মোট চারটি অধ্যায়ে বিভাজিত করে সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প গুলির বিশ্লেষণে সার্বিক জীবন চিত্রণ ও শিল্পরূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথম অধ্যায় — সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্য কৃতি, দ্বিতীয় অধ্যায় — সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে জীবন চিত্রণ, তৃতীয় অধ্যায় — সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে বাক্-নির্মাণ, চতুর্থ অধ্যায় — সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য ও মূল্যায়ন। এই মোট চারটি অধ্যায় বিভাজনের মধ্য দিয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা রেখেছি।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৩।

২। কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর (১৮৯১-২০০০), অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১-২।

৩। 'Critical Companion to Nathaniel Hawthorne : A Literary Reference to His Life and Work', Sarah Bird Wright, Review of Hawthorne's 'Twice-Told-Tales', Edgar Allan Poe, p. 333.

৪। 'English Literature and Introduction for Foreign Readers', R.J. Rees, p. 203.

৫। 'The Philosophy of The Short-Story', Brander Matthws, p. 88.

৬। সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ২০২।

৭। ছিন্নপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র সংখ্যা-১০৬, পৃ. ৮৮।

৮। কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর (১৮৯১-২০০০), অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১১০।

৯। সাগর থেকে ফেরা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'হারিয়ে', পৃ. ১৯ ।

——oo——